ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 295-303
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.461

ছিন্নমস্তা: বিশ্লেষণের আলোকে

ড. অপর্ণা দেব, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সন্তোষ কুমার রায় মহাবিদ্যালয়, হাইলাকান্দি, অসম, ভারত*

Received: 29.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The short stories of Ashapurna Devi explore the inner lives of women, portraying their responsibilities, struggles, and emotional experiences within familial and social structures. Her narratives emphasize the complexities of middle-class life, drawing on her own experiences to present authentic depictions of women's realities. Through a perceptive artistic lens, she reveals the often-unnoticed dimensions of familiar characters, highlighting their hidden strengths, conflicts, and aspirations. Her stories express a subtle form of silent protest in everyday life, particularly among middle-class women, giving voice to their unspoken struggles through figures such as housewives, widows, and domestic workers.

Rather than presenting women as outright rebels, she depicts a restrained and nuanced form of resistance emerging from within the domestic sphere. Her women are dignified, capable, and morally resilient, often surpassing men in integrity. In doing so, her work addresses a significant gap in earlier literature that overlooked
the psychological realities of middle-class women.

Keywords: women's protest, women's lives, silent resistance, middle class, dignity

> "উপন্যাস আমাকে অনেকটা প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। তবু ছোটগল্পের উপরেই আমার পক্ষপাত। কেন? ..... হয়তো ছোটগল্পই আমার প্রথম প্রেম বলে। এখনও ছোটগল্প লিখতেই বেশি ভালো লাগে,এটাই ঘটনা। ..... আমার মনে হয় উপন্যাস লেখা যেন একটা 'কাজ' আর ছোটগল্প লেখাটা হচ্ছে 'আনন্দ'..... ওতে তো কোন কাঠখড় পোড়াতে হয় না। আপনি হয়ে ওঠে।"[১]

সৃষ্টিশীল সাহিত্যে কর্মের মধ্যে ছোটগল্পই যে আশাপূর্ণা দেবীর প্রধান আকর্ষণ, এই স্বগতোক্তি তারই প্রমাণ। এই 'হয়ে ওঠার' শিল্পকে তিনি সব থেকে বেশি ভালবাসতেন। বাংলা ছোটগল্পের বিস্তৃত অঙ্গনে আশাপূর্ণা দেবীকে বাদ দিয়ে কিছুই ভাবা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস ও গল্পের ধারায় যে কয়েকজন কথাসাহিত্যিক নারী জীবনের নানা বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেছেন, মানব মনের অন্তঃকোণে পড়ে থাকা ছোট্ট হৃদয়কে নিয়ে চিত্রিত করেছেন, তাদের মধ্যে খুব সহজে বলতে পারার অনায়াস দক্ষতা ছিল

আশাপূর্ণা দেবীর। সৃষ্টির আনন্দে তিনি অসংখ্য ছোটগল্প রচনা করেছেন। সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ জীবন কথাতেই তাঁর গল্পের সিংহভাগ পরিপূর্ণ। অসংখ্য মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যাকে খুব সহজে বলতে পারার অনায়াস দক্ষতা ছিল আশাপূর্ণা দেবীর। খুব সহজে পরিবার জীবনের চিত্রাঙ্কন করেছেন তিনি। পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে থেকে চোখে দেখা চরিত্রগুলিকে নিয়ে তুচ্ছাতীতুচ্ছ ঘটনার আলোকে সমাজ ও ব্যক্তিকে একই দর্পণে বিশ্লেষণ করেছেন। সাহিত্য তাঁর সৃজনশীল লেখার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। অনেক গল্পে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার গভীরে আলো ফেলার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। আশাপূর্ণা দেবীর অধিকাংশ গল্পই নারী চরিত্রের দৃষ্টিকোণে রচিত, সেখানে নারী চরিত্রই প্রধান। কিন্তু সব নারীকে একই ছাঁচে ফেলা যায় না, ভিন্ন স্বাদের গল্পে ও পরিসরে আশাপূর্ণা দেবী নারী চরিত্রে বৈচিত্র্যর সন্ধান দিয়েছেন। লেখিকা পাঠকের সামনে জটিল সমস্যা জর্জর নারীর অবস্থানটুকু তুলে ধরলেও, সমাধান খোঁজার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকের উপর। নবনীতা দেব সেন আশাপূর্ণা দেবীর নারী চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "আশাপূর্ণার ছোটগল্পে মেয়েরা পুরুষ চরিত্রের তুলনায় অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন, অনেক বেশি পূর্ণতা পেয়েছেন। নারীর চোখেই তো পৃথিবীটা দেখা আশাপূর্ণার। 'আমি'হীন কি লেখা হয়? সব লেখাতেই তার নিজের 'আমি'টা অন্তরালে কাজ করে চলে। তাই হয়তো আশাপূর্ণার নারীরা অনেক সুসম্পূর্ণ, নীচতা হীনতায়ও যেমন তারা পুরুষকে হার মানায়, ত্যাগের ব্যাপ্তিতে, বুদ্ধির ক্ষিপ্রতায়, বোধের গভীরতায়, সংযমের তীব্রতায়ও তারাই জিতে যায়। দুঃখে- সুখে আশাপূর্ণার পুরুষেরা বুঝি একটু কম বর্ণময়। তাঁরা পিছনের আসনে। .....সূক্ষ্ম, জটিল, দ্বন্দ্বজর্জর মানসিকতার অধিকারী নারীরাই। শোষিতের ভূমিকাতেও তাঁরা, শোষকের ভূমিকাতেও তাঁরাই।"[২]

বাংলা ছোটগল্পের বিস্তৃত অঙ্গনে আশাপূর্ণা দেবীকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবাই যায় না। তবে লেখিকার মেয়েবেলা খুব সুখকর ছিল না। তৎকালীন যুগের ভিত্তিতে এবং সমাজের নিরিখে তাঁর ছোটবেলা অন্য পাঁচজনের মতো ছিল না। তিনি অত্যন্ত দুরন্ত, ডানপিটে, খুব চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। মার্বেল খেলতে, দাদাদের সঙ্গে কেরাম খেলতে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। মাটি, কাঠ দিয়ে ঘর বাড়ি তৈরির নেশা ছোট থেকেই ছিল– সংসার জীবনের সুগৃহিনীপনাই তার ইঙ্গিত দেয়।

শুধু তাই নয় পুতুল খেলতেও ভালবাসতেন তিনি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না পেলেও নিজের উদ্যোগে তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন একজন বিখ্যাত অঙ্কন শিল্পী। চিত্রশিল্পী হরেন্দ্রনাথের সুক্ষ্ম অনুভূতি, গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির অপূর্ব ক্ষমতা তাকে দক্ষ চিত্রকর হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে আশাপূর্ণা দেবী পিতার এই তিনটি গুনই পেয়েছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর মা সরলা সুন্দরী সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর মায়ের কাছ থেকে সাহিত্য পাঠের প্রতি আগ্রহ এবং জীবন সম্বন্ধে এক অদম্য অনুসন্ধিৎসা লাভ করেছিলেন। স্কুলে যাবার সুযোগ না ঘটলেও দাদাদের লেখাপড়া শুনেই তার অক্ষর পরিচিতি হয়েছিল। নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই মায়ের সব সংগৃহীত বই পড়ে এবং নিজের মতো করে তার রস গ্রহণ করতেও সক্ষম হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তবে বিধাতা নাকি তাঁকে জগত দেখার নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিলেন। বাল্য বয়স থেকে কঠিন অবরুদ্ধের মধ্যে বড় হলেও মনটাকে চার

দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। পিতা ও মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে কল্পনাশক্তি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি লাভ করেছিলেন তাকে পাথেয় করে চারপাশের পরিচিত জগৎটাকে শিল্পীর তুলিতে নূতন করে রাঙিয়ে তুলেছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের অজস্র ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত খন্ডিত ব্যক্তিসত্তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব, পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান এবং সম্ভাবনা এইসব নিজের চোখ দিয়ে খতিয়ে দেখেছেন। পাশাপাশি নারীর নিজস্ব মূল্য, চেতনার ক্ষয়, পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে নারীর সমস্যা ও যন্ত্রণা তাঁর গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার বন্ধন, শাসন ও অনুশাসনের বিরোধিতায় সরব ছিলেন তিনি।

আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্যে তাদের কথাই লিখেছেন যারা অত্যন্ত কাছে থেকেও আমাদের কাছে অপরিচিত ছিল। শিল্পীর চোখ দিয়ে চারপাশের সমাজটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং নিজের দেখা অভিজ্ঞতাকে বাণী রূপ দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর লেখায় নারীর দৃষ্টিকোণে নারীর মূল্যবোধের সংকট ধরা পড়েছে। নারী হয়েও তিনি নারী জগতের রূপকার, নারীর অন্দরমহলের বার্তাবাহক। মৈত্রেয়ীদেবী বলেছিলেন, "আশাপূর্ণা প্রত্যেকটি মেয়ের কৃতজ্ঞতার পাত্রী- তিনি যেমন ভাবে মেয়েদের কথা লিখেছেন সেভাবে আর কেউ লেখেন নি।"[৩] তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নারীর প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়ে না। লেখিকা শুধু অন্তঃপুরের নারীর প্রকৃত পরিচয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে।

আবহমান কাল ধরে পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে থেকে লেখিকা সম্পর্কের টানাপোড়েনের ছবি সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আবিষ্কার করেছেন। চিরদিন মানুষ যাকে সৎ ভালো মানুষ জেনে এসেছে, তার মধ্য থেকেই হঠাৎ বেরিয়ে আসে এক অসৎ মানুষের ছবি, আবার কখনও অভদ্র ইতরের ভেতর থেকে লুকিয়ে থাকা ভালো মানুষটিও বেরিয়ে আসে। কেউ পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে শয়তানি করলেও, কোন কোন পরিস্থিতিতে অনেক জটিলতার মধ্যেও কেউ বিবেকবান মানুষের পরিচয় দেয়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখিকা জানিয়েছেন,

> "সবাই উঠে এসেছে আমার জীবনের পারিপার্শ্বিক পটভূমি থেকে। যা লিখেছি আমার মধ্যবিত্ত গন্ড থেকেই দেখা। চিরদিন দেখেছি, আপাতদৃষ্টিতে যাকে সুখী মনে হয় সে হয়তো আদৌ সুখী নয়, আবার যাকে নেহাত দুঃখী মনে হয়, সে সত্যিকারের দুঃখী নয়, বাইরের চেহারা আর ভিতরের চেহারা দুটির মধ্যে হয়তো আকাশ -পাতাল তফাৎ। সেটাই অনেক সময় আমার লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়।"[৪]

আশাপূর্ণা দেবী কত বিচিত্র চরিত্র অংকন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। নিজের সৃষ্ট চরিত্র গুলির প্রতি তাঁর গভীর মমতা সাধারণ মানুষের উপর তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। সেই সঙ্গে চরিত্র তৈরিতে স্রষ্টার নির্মম নিরাসক্তিও চোখে পড়ে। আশাপূর্ণা দেবী বাঙ্গালী পারিবারিক জীবনের বিশ্বস্ত কথাকার। লেখিকা তাঁর দৃষ্টি দিয়ে ত্রিশের দশকের পর থেকে পারিবারিক মূল্যবোধের যে ভাঙ্গন ও অবক্ষয় দেখেছিলেন তাই গল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন।

'ছিন্নমস্তা' তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প। 'ছিন্নমস্তায়' আশাপূর্ণা দেবী সেই অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। মূলত যা ছিল মূল্যবোধের অবক্ষয়। একজন যথার্থ কথাকারের মমতা, সহানুভূতি আশাপূর্ণা দেবীর ছিল, তবে বিশ শতকীয় বুদ্ধি বৈদগ্ধ্যে তা নিরাসক্ত থাকে নি। কল্লোলের লেখকরা যেভাবে জীবন-সাহিত্য-শিল্পকে নূতন চিন্তাভাবনায় ও দর্শনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, সেই সময়ে আশাপূর্ণা দেবী নিজস্ব জগতে থেকে সাহিত্য রচনা

করেছেন। কল্লোলের সময়কে বোঝার ক্ষমতা লেখিকার ছিল না। তিরিশের দশকের শেষে যুদ্ধের সর্ববিনাশী স্বভাবকেও আশাপূর্ণার বুঝে উঠা হয় নি। ধূর্জটি প্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমূখ লেখকেরা যখন বাংলা ছোট গল্পের প্রকরণ ও বিষয় নির্বাচনে মানুষজন নিয়ে চিন্তিত, ঠিক তখনই আশাপূর্ণা দেবী সহজ কণ্ঠে পারিবারিক জীবনের ছবি আঁকতে গল্পের আসরে নামেন। সভ্যতার বহু শতাব্দী পেরিয়ে আধুনিক যুগে এসে যেখানে চিন্তা-চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ আগের চেয়ে অনেকটাই পরিবর্তিত, সেখানে একটা বড় সমস্যা একজন নারী অন্য নারীকে অনুশাসনের আওতায় দেখতে অপছন্দ করছে না, সেই দায়টা যে শুধু পুরুষতন্ত্রের তা বলিই বা কি করে? সে দায় আসলে আমাদের, মননের বুদ্ধি কিংবা চেতনার ভুল চর্চার। আমাদের দেখার চোখটা মূলত আমাদের নয়, শাস্ত্র শাসনে দেওয়া দৃষ্টিভ্রম, যাপিত জীবনের নিয়ম নিষেধকে তাই অবজ্ঞা করতে মন চায় না। আশাপূর্ণা দেবীর বেশিরভাগ গল্পের পটভূমি মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের অন্দরমহল, বিষয়বস্তু ছিল পরিবারকেন্দ্রিক সম্পর্কের টানাপোড়েন। তবে চির পরিচিত প্রেক্ষাপট গল্পের পটভূমি হলেও চেনা ঘটনার অন্তঃস্থলে মানব মনের অন্ধকারচ্ছন্ন দিকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণে লেখিকার গল্প গুলো কালজয়ী হয়ে উঠেছে। গল্পে চেনা ঘটনাগুলিকে লেখিকা এমনভাবে সাজিয়ে তুলেছেন যেখানে অচেনা সত্যের নির্মম প্রকাশ ঘটেছে। নারীর মাতৃত্ব নিয়ে বহু কালাবধি চলে আসা বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে আঘাত করাতেই 'ছিন্নমস্তা' গল্পটি পৃথক মাত্রা পেয়েছে। প্রতিশোধ স্পৃহা মানুষকে কত নিচে নামতে পারে - এই উদাহরণ আলোচ্য গল্পের মধ্যে জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর 'ছিন্নমস্তা' গল্পটি এক অবক্ষয়িত মূল্যবোধের ছবি। বাঙালি পরিবার জীবনের তিক্ত ও মধুর রূপটি পরিবেশিত হয়েছে এই গল্পে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের বিধ্বস্ত পরিবেশের ছবি এ গল্পটিতে নূতন মাত্রা পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমস্ত প্রথা ভেঙে গল্প যখন নূতন নূতন রূপ নিয়ে অবয়ব তৈরিতে ব্যস্ত, সেই সময় আশাপূর্ণা দেবী গল্প লিখছেন আপন গণ্ডিতে বসে। দেশ-কাল-সমাজ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে তিনি নারীর আত্মিক অবস্থান খুঁজে নিতে প্রয়াসী ছিলেন। তাই তাঁর রচনায় রক্তমাংসের মানবসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। লেখিকা নারীর নিজস্ব পরিসরটাকে খুঁজতে চান ভিতর আর বাইরের হওয়া না হওয়া বাস্তবতার জগৎ থেকে।

তবে যখন নারীর নিজস্ব প্রতিবেদন গড়ে উঠে আরেক নারীর কলমে তখন লেখক কী শুধু নিছক কথকের ভূমিকা নেন। নাকি লেখক এর নিজস্ব অভিমত প্রকাশ পায় ভাবনার চোরাস্রোতে? এই সূত্র ধরেই আলোচ্য গল্পের আলোচনায় সত্যের সন্ধানই আমাদের আগ্রহ।

'ছিন্নমস্তা' গল্পটি ১৯৪৯ সালের শারদীয়া উৎসবের আগে লেখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়, ১৯৪৬ এর দাঙ্গা পরবর্তী এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ের রচনা। সবে মাত্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অবসান ঘটেছে। ঠিক সেই সময়ে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বর্তমান গল্পের বিষয় নিয়েছেন বিধবা শাশুড়ির ও তরুণী বধূর পারিবারিক ও সামাজিক সংঘর্ষ ও মনোবিকারের অধোগতির বিবরণে। 'ছিন্নমস্তা' গল্পটিতে আত্মরতি সম্পন্ন মানুষের অধোগতি প্রায় চরমে পৌঁছে গেছে।এখন ঘরে ঘরে যেভাবে বধূ হত্যা বধূ আত্মহননের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে থাকে, সে সময় তেমন ছিল না। পারিবারিক ঘটনায় দেখা যেত বধূ নির্যাতন, বধূর যন্ত্রণা, শাশুড়ির অভিমান এবং অহংকারের দাম্ভিকতা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার সংবাদ তেমন মিলত না। এর কারণ বোধ হয় এমন এক বিষয় যেখানে প্রত্যক্ষভাবে পারিবারিক সামাজিক, সমস্যার উর্ধ্বে বধূ নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও

শাশুড়ির দিক থেকে নিজ অতীতের বধূ অবস্থায় অত্যাচারিত হওয়ার অভিজ্ঞতা, চাপা আক্রোশ এক কেন্দ্রীয় সমস্যার সৃষ্টি করে। বস্তুত নারীর জগত তার সংগ্রাম, বঞ্চনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির প্রক্রিয়াজাত অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। যাদের জীবনে কোন আড়ম্বর নেই,অতীত যাদের আর পাঁচটা বাঙালি মধ্যবিত্তের মত সহজ স্বপ্নে ভরপুর এবং বর্তমান যাদের সেই সহজ স্বপ্নের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম তেমনি জয়াবতী-প্রতিভা-বিমলেন্দুর কথা। তাদের আনন্দ, তাদের দুঃখ, তাদের সম্পর্কের জটিলতা 'ছিন্নমস্তা' গল্পের বিষয়বস্তু।

'ছিন্নমস্তা' গল্পের কাহিনি অংশ সামান্যই। গল্পের কাহিনিতে দেখা যায় সন্তান নিয়ে মা-বাবার সুখী সংসার। জয়াবতী আর দেবনাথের একমাত্র পুত্র বিমলেন্দু। জয়াবতী স্বামীর প্রতি আনুগত্যে এবং সন্তানের প্রতি ভালোবাসায় এক সফল গৃহিণী। হঠাৎ করে দেবনাথের মৃত্যু ঘটায় কিছুটা ছন্দপতন হলেও জীবন যথারীতি এগিয়ে যায়। বিধবা জয়াবতী একা পুত্র বিমলেন্দুকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন কাটান। পুত্র কলকাতায় চাকরিরত। মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে অপত্য স্নেহ, মমত্ব, বুক ভরা আশীর্বাদ, মায়ের প্রতি ছেলের বিনয়ের সম্পর্ক সবই অটুট। সপ্তাহের শেষে ছেলে বাড়ি এলে মাতা পছন্দের খাবার তৈরি করে খাওয়ান। রাতে খাওয়ার সময় ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প চলে মা ছেলেতে। গল্প যেন আর থামতেই চায় না। মাতা ও পুত্রের এমন সুখ শান্তিময় অখন্ড জীবন প্রবাহে পুত্রের বিবাহের মতো আনন্দের দিন উপস্থিত হল। গল্পের শুরুই হলো হুগলী থেকে বিয়ে করে বউ নিয়ে ঘরে ঢোকার খবরের মধ্য দিয়ে। ছেলের বিয়ে নিয়ে জয়াবতীর অনেক সাধ ছিল। অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল ছেলেকে বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে তুলবেন। মনের মত আলপনা দিয়ে বধূবরণের অনুষ্ঠান করবেন বলে মাটির উঠান পাকা করেও রেখেছিলেন। বধূবরণ এর জন্য পছন্দ করা শাড়িও কিনে রেখেছিলেন। কিন্তু এসব সাধ জয়াবতীর পূরণ হলো না। বিধবা হয়ে যাওয়ায় বুকের স্বপ্ন বুকে চেপে মারতে হল জয়াবতীকে। সব সাধ বৈধব্যে ঘুছিয়ে নিলেও মনের একমাত্র সাধে কোন ভাঁটা পড়ে নি। জয়াবতীর অনেক সাধ ছিল মনের মতো, প্রতিমার মতো সুন্দর বউ ঘরে আনবেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে সুখী সংসার করবেন। পুত্রকে সফল সংসারী করার বাসনায় বিধবা মায়ের দিক থেকে কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটি করেন নি। প্রতিষ্ঠাও প্রাপ্তিতে ভরপুর সংসারে মনের মত পুত্রবধূ নির্বাচনের জন্য গ্রাম্য প্রেক্ষাপটকেই বেছে নিলেন। জয়াবতীর ইচ্ছা ছিল তার বউ যেমন সুন্দরী হবে, তেমনি শান্তশ্রী, সৌম্য ও মমত্বময়ী হবে। শুধু তাই নয় শাশুড়ি বউয়ের তিক্ত সম্পর্ক নিয়ে যে প্রথার প্রচলন হয়ে আছে, জয়বতীর ইচ্ছা ছিল তিনি তার ভুল প্রমাণ করে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত তৈরি করবেন। পরের মেয়েকে আপন করে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেও বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে জয়াবতীর এই স্বপ্ন-সাধ মুহূর্তে খান খান হয়ে যায়।

বৈধব্যই ছিল জয়াবতীর যন্ত্রনা। একমাত্র মেধাবী পুত্র মায়ের প্রতি অনুগত ছিল, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার ভরপুর ছিল, সংসারে অপ্রতিহত কর্তৃত্ব ও আত্মীয় প্রতিবেশীদের কাছে একটি সম্মানজনক ভাবমূর্তি জয়াবতীর আত্মবিশ্বাসকেই পুষ্ট করেছিল। কিন্তু নববধূ প্রতিভার আগমনে জয়াবতীর সব স্বপ্ন আস্তে আস্তে ভাঙতে লাগলো। শান্তশ্রী দেখে যে পুত্রবধূকে গড়ে এনেছিলেন সেই প্রতিভা একে একে শাশুড়ির সমস্ত কল্পনা ধুলিস্যাৎ করে দিল। নববিবাহিতা বধূ প্রতিভা বিরক্তি আর অসহিষ্ণু মন নিয়ে শ্বশুরবাড়ির সবকিছুতেই খুঁৎ ধরতে শুরু করল। অজ পাড়াগাঁয়, জানালায় ছেঁড়া কাপড়ের পর্দা, চুল বাঁধার জন্য বড় আয়নার অভাব এমনকি জয়াবতীর সখের খাওয়া-দাওয়ার প্রতিও কটাক্ষ করতে প্রতিভা ছাড়ে নাই। পুত্রবধূকে গ্রাম্য মেয়ে দেখে নির্বাচন করেছিলেন অল্প

দিনের মধ্যেই সেই প্রতিভা বুঝিয়ে দিল সে শহরের মেয়ে থেকেও ওস্তাদ কম নয়। একমাত্র ছেলেকে কেড়ে নিল মায়ের কাছ থেকে। স্বামী-স্ত্রী মিলে শহরে চলে যাবার মনস্থ করল। পুত্র বিমলেন্দুও বিবাহের আগের দিনগুলির মতো মায়ের সঙ্গে আপন হয়ে কথা বলে না, সে মাকে এড়িয়ে যায়। প্রতিভা বিমলেন্দুকে একদিন বোঝায়- 'আসল কথা হিংসে! হিংসে! বিধবারা ভারী হিংসুটে হয়, বরাবর জানি আমি। নিজেদের সাধ-আহ্লাদ সব গুছে গেছে কী না, তাই পরের সুখ দেখলেই হিংসে প্রাণ ফাটে। এই যে তুমি আমার কাছে একটু বসো, কি দুদন্ড গল্প করো --- সহ্য হয় না। বুক ফেটে যায়।' মায়ের সঙ্গে দু-মুহূর্ত কথা বলার যার সময় নেই, দীর্ঘ রাত জেগে বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে তার সময়ের অভাব হয় না। জয়াবতী এ নিয়ে ছেলেকে কিছু বলতে পারেন না বলতে গেলেও যেন তার রুচিতে বাধে। বৌমার ব্যবহারে তো বটেই, ছেলের এমন ব্যবহার ও পরিবর্তনে জয়াবতী মনে মনে কঠিন আঘাত পেলেন। কিন্তু কি আর করার আছে তার? তাই সবকিছু সহ্য করে, বিষাদ গ্রস্ত মনের রাগ মনে চেপে থাকতে থাকতে ক্রমশ নিরাশ হতে লাগলেন। যে সন্তানকে আঁকড়ে ধরে নিঃস্ব রিক্ত মা স্বপ্ন দেখতেন, সেই সন্তান যদি মায়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে তাহলে মায়ের মনে ক্ষোভ জমা হওয়াটাই স্বাভাবিক। মায়ের প্রতি বিমলেন্দুর নীরব অবজ্ঞা, জয়াবতির মনে এক গভীর হতাশার জন্ম দেয়। বউয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং মায়ের প্রতি নীরব অবজ্ঞা, জয়াবতীকে প্রতিহিংসা পরায়ন করে তুলে।

মুখে এমন ইচ্ছের কথা অধিকাংশ মেয়েরাই বলে থাকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটে অন্যরকম। সাংসারিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় ছুটি মেলেনা, আর এদিকে নিজের হাতে গড়া সংসারের মায়া আরো বেশি তীব্র হয়। এমন পরিস্থিতিতে নতুন প্রজন্মের কাছে নিজেকে একান্ত প্রয়োজনীয় করে তুলতে প্রয়াসী হয় অধিকাংশ মায়েরা। ঠিক এই রকমই পরিস্থিতিতে সব সহ্য করে সব মেনে নিয়ে আগেরকার মতো সাংসারিক কাজও করছিলেন জয়াবতী। ছেলেকে - বউকে খেতে দিচ্ছিলেন। শুধু তার মনে সুখ ছিল না -ছিল না শান্তিও। বিমলেন্দুর মায়ের প্রতি নিস্পৃহতা ও স্ত্রীর আচরণে প্রচ্ছন্ন সমর্থন এই গল্পটির জটিলতা সৃষ্টি করেছে। তার উপর বিমলেন্দুর ব্যক্তিত্বের অভাব তাতে নূতন মাত্রা যুক্ত করেছে।ছেলে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর, জয়াবতী রান্না খাওয়া গৃহস্থালির নানান কর্মে আপন কর্তৃত্ব নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। তবু পুত্রবধূর সঙ্গে অনিবার্য সংঘাতকে এড়াতে পারেননি।

প্রতিভা দুই মাস পিত্রালয়ে কাটিয়ে শ্বশুরালয়ে আসার পর, এক শনিবারে স্বামীর জলখাবারের উদ্বেগ নিলে শাশুড়ির সঙ্গে তীব্র বিরোধ বাঁধে। এই বিরোধের মূলে জয়াবতীর এতদিনের পুরনো সংস্কার। আধুনিকা পুত্রবধূ প্রতিভা জয়াবতীর প্রথাসিদ্ধ সংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করে। এই বিরোধ শাশুড়ি বউয়ের মানবিক সম্পর্কে তীব্র ফাটল ধরায়। ক্রমে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর এই বিরোধ মর্যাদারক্ষার সস্তা লড়াইয়ের রূপ নেয়। একদিন খাওয়ার সময় অল্প তরকারির কথা তুললে জয়াবতী কাঁসি - ভর্তি ডাঁটা চচ্চড়ি খেতে দিলেন বৌমাকে। এ নিয়ে বাঁধলো চরম বিপত্তি। বউমা কাঁসি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জানালো বিধবার মত বসে বসে ডাঁটা খাওয়ার কথা সে বলেনি। আসলে নিজের পছন্দ বলে জয়াবতী ডাঁটা রেঁধেছে, তাই ওই ডাঁটা জয়াবতীই খাক। 'বিধবা মাগিদের মতন গাদাগাদা চচ্চড়ি খাবার এত সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করলেন কেন, রাখলেই পারতেন নিজের জন্য। আপনার লোভের জিনিস।' এই মোক্ষম আঘাতে জয়াবতী নিজেকে চরম অপমানিত বোধ করলেন। এই

অপমানে মাতা ও পুত্রের যে অদৃশ্য বন্ধন অল্প বেঁচেছিল, তা একেবারেই নির্মূল হয়ে গেল। তিক্ততা শেষ পর্যন্ত চরম নিষ্ঠুরতায় পৌঁছে গেল। 'বিধবা মাগী' বলে প্রতিভা শুধু নিজের শাশুড়িকে অপমান করেনি, সমস্ত স্বামীহীন মহিলাদের দুর্ভাগ্যকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করেছে। প্রতিশোধ স্পৃহায় পাগল হয়ে দর্পহারি মধুসূদনের কাছে জয়াবতী প্রার্থনা করলেন - পুত্রবধূর অনুরূপ দুর্ভাগ্যজনক ভবিতব্য লাভ। পুত্রবধূর কাছে নিষ্ঠুর আঘাত পেয়ে মা তার সন্তানের জন্য ইষ্টদেবতার কাছে চরম অনিষ্ঠ প্রার্থনা করলেন।

আশাপূর্ণা দেবী 'ছিন্নমস্তা'গল্পে মাতৃ মনের এমন পরিবর্তনকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে সত্য উদঘাটন করেছেন। এই পর্যায়ে লেখিকা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। মায়ের কাছে সন্তানের প্রাণ সবচেয়ে মূল্যবান। চরম আঘাতে বিপর্যস্ত জয়াবতী হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ইষ্ট দেবতার কাছে পুত্রের মৃত্যু কামনা করেছিলেন। এই গল্পে প্রতিশোধ স্পৃহা এমন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে যেখানে জয়াবতীকে আত্মঘাতী 'ছিন্নমস্তা' বলেই মনে হয়। স্বয়ং লেখিকা এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "মানুষের যতটুকু দেখা যায় সেটুকু তার সব নয়, যেটা দেখা যায় না সেটা অনেকখানি .....কারণ সে জানে না যে শুধু তার পরিবেশের কাছেই অসহায় নয়, অসহায় আপন চিত্ত বৃত্তির কাছেও। জানেনা তার অবচেতন সত্তা কিভাবে তার চেতন সত্তাকে পরিচালিত করে চলে, জানে না মাকড়সার মতোই সে অবিরত নিজেকে ঘিরে জাল রচনা করে নিজেকেই বন্দি করে চলেছে।"[৫]

কিছুটা বাধ্য হয়েই জয়াবতীকে দর্পহারি মধুসূদনের কাছে শেষ বিচারের জন্য প্রার্থনা জানাতে হয়। এখানে লেখিকা মাতৃমনের পরিবর্তনকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে সত্য উদঘাটন করতে চেয়েছেন। আর সেই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমিতে রেখেছেন একটি বিশেষ সংস্কার। সেই বিশেষ সংস্কারটি হচ্ছে নারীর বৈধব্য দশা। প্রতিভা শাশুড়ির বৈধব্য দশা নিয়ে বারবার খোঁটা দিতে থাকলে প্রতিহিংসায় জয়াবতী পুত্রবধূর বৈধব্যই কামনা করলেন। যুগ যুগ ধরে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর এ ধরনের সংগ্রাম পরিবারগুলিতে আবর্তিত হতে থাকলেও প্রতিহিংসার এমন দৃষ্টান্ত বিরল।চরম বিরক্তিকর মুহূর্তে মায়ের অন্তর ছেলের অনিষ্ট কামনায় মুখর হয়ে উঠেছিল।প্রতিহিংসাপরায়ণ নারীর কাছে সম্পূর্ণরূপে এখানে মাতৃত্ব পরাজিত হয়েছে। নিতান্ত কাকতালীয়ভাবে হলেও তার মনের ভিতরের সুপ্ত ইচ্ছার ফলশ্রুতিতে যেন হঠাৎ করে বিমলেন্দুর মৃত্যু হয়। মায়ের প্রার্থনায় ছেলের মৃত্যুতে ঈর্ষা পরায়ণ পুত্রবধূর বৈধব্যকে ডেকে আনল। পুত্রের মৃত্যুতে বাইরের থেকে জয়াবতীকে দুঃখী মনে হলেও অন্তঃকরণে তিনি খুশিই হয়েছিলেন।

বিমলেন্দুর মৃত্যু গল্পের দুই প্রতিযোগিনী নারীর অবস্থানকে পরিবর্তন করে দেয়। স্বামীর মৃত্যু মুখরা প্রতিভাকে একেবারে নিশ্চুপ করে দিয়েছে। তবে জয়াবতীর প্রতিশোধস্পৃহা এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল,তাই আত্মজের মৃত্যু মায়ের মনে প্রতিশোধ পূরণের আনন্দ দিয়েছে। গল্পের শুরুতে মায়ের মমত্ব এবং গল্পের পট পরিবর্তনে পুত্রের মৃত্যু কামনা, মাতৃহৃদয়ের এই হিংস্রতা যে কোন মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলবে। গল্পটির পর্যালোচনায় দেখি চরম আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে সাময়িক হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মাতা ইষ্ট দেবতার কাছে পুত্রের অমঙ্গল কামনা করেছিলেন। প্রবল আঘাতে সদ্য বিধবা প্রতিভার মুক হয়ে যাওয়া ও জয়াবতীর বিদ্রূপাত্মক খুশি হওয়ার মাধ্যমে কাহিনিটি উপসংহারে নেমেছে।

নারীর হৃদয়ের অন্তঃস্থলের অন্তঃকোণ থেকে নিঃসৃত গোপন বেদনা ,কামনার চাহিদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দুই অসম বয়সি নারীর মধ্যে অদৃশ্য প্রতিযোগিতার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে লেখিকা গল্পটির জাল বুনেছেন। এই গল্পটিতে শাশুড়ি-বউ এর ক্ষমতা কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের এক জটিল চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। নিজ সন্তানকে হারিয়ে জয়াবতীর শোক ও অনুতাপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বিধবা পুত্রবধূর সামনে সহজ থেকেও দুচোখে গোপন রেখেছেন বিষাক্ত হাসি। 'চোখের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোণের অতি সূক্ষ্ম রেখায় লুকানো বিষাক্ত হাসির আভাসে' -- এই মন্তব্যই স্পষ্ট করে দিল বিধবা বৌমার প্রতি জয়াবতীর সমস্তই ছদ্ম করুণা।

গল্পের পর্যালোচনায় দেখি পুত্রবধূকে নিয়ত চোখের সামনে দেখে প্রতিহিংসা পূরণের বাসনায় তিনি আনন্দই লাভ করেছেন। তাই প্রতিভার দুর্ভাগ্য নিয়ে তিনি সকাতর মমত্বে বিলাপ করেছেন।পুত্রবধূকে বৈধব্যের আচরণগুলি পালনে বাধ্য করেন, বাধ্য করেন শাক-পাতা-কচুর অন্ন মুখে তুলতে। জয়াবতী রান্না করে প্রতিদিন বৌমাকে গভীর মমতায় খাওয়ান। প্রতিভার পেট ভরানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধের আনন্দে তার মন ভরে উঠে। বউ -টাকে 'অপয়া' বলে বিদায় না দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে মারার আনন্দ পেয়েছেন পুত্রের প্রাণের মূল্যে। বিধবা বৌমার প্রতি তার মমত্বের পরিচয়ে পাড়াপড়শিরা সাবাসি দেয়। এই মমত্বের পিছনে লুকিয়ে থাকে জয়াবতীর আসল ছদ্মবেশ - যা এই চরিত্রটির climax। নির্মম ক্ষমাহীন চিত্তে প্রতিপক্ষকে বাগে আনার উল্লাসে তিনি ছেলের মৃত্যুকে আনন্দে সামলে নিয়েছিলেন।

আসলে 'ছিন্নমস্তা'য় রয়েছে সংস্কারের সঙ্গে মানবত্বের যুগ্ম লড়াই। কিছু কিছু মনোবৃত্তি বলবতী হলে মানুষকে ধ্বংসের অতলে নিমজ্জিত করে তারই চিত্রণে মুখর হয়েছে গল্পটি। গল্পটির আরম্ভ ও শেষ সূক্ষ্ম শিল্প সম্মত। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে 'ছিন্নমস্তা' গল্পের জুড়ি মেলা ভার। আশাপূর্ণা দেবীর সমগ্র গল্পের চরিত্র সৃষ্টিতে লেখিকার শিল্পদৃষ্টি সম্বন্ধে নবনীতা দেবসেন বলেছেন,

> "তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি দেখি প্রায়ই বিবেক নির্দিষ্ট নৈতিকতার বাইরে সমাজ নির্দিষ্ট সুনীতি বোধকেই মান্য করে চলে। এই এক আশ্চর্য গূঢ় দ্বন্দ্ব আছে আশাপূর্ণাতে।"[৬]

তথ্যসূত্র:

১. দেবসেন, নবনীতা। ভূমিকা, আশাপূর্ণা দেবীর ছোট গল্প সংকলন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া চতুর্থ মুদ্রণ-২০০২, পৃ. xvi

২. তদেব, পৃ.xvii।

৩. বসু, অরুন কুমার। কথাশিল্পের নানা দিক। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০১৫, পৃ. ২৯৫।

৪. দেবী, আশাপূর্ণা। 'যা দেখি তাই লিখি', আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, চতুর্থ মুদ্রণ -২০০২ পৃ. xi ।

৫. পাল, শ্রাবণী সম্পাদিত। বাংলা ছোটগল্পের পর্যালোচনা। বিশ শতক, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৫৯।

৬. নবনীতা দেবসেন, 'ভূমিকা,' 'আশাপূর্ণা দেবীর ছোট গল্প সংকলন' ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া,চতুর্থ মধ্যম মুদ্রণ -২০০২ পৃ. xix।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বসু, অরুন কুমার। কথাশিল্পের নানা দিক। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০১৫।

২. দেবী, আশাপূর্ণা। গল্প সংগ্রহ দ্বিতীয় খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা -৯, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল- ২০০৯।

৩. দেবসেন, নবনীতা। ভূমিকা, 'আশাপূর্ণা দেবীর ছোট গল্প সংকলন'। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া,চতুর্থ মুদ্রণ- ২০০২।

৪. দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা ছোট গল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রথম খন্ড। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩।

৫. পাল, শ্রাবণী সম্পাদিত। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনায়: বিশ শতক। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা ২০০৮।